অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ থেকে বাঁচতে করণীয়

গ্রিক শব্দ অ্যানথ্রাক্স (Antharx) এর বাংলা তড়কা রোগ এবং আভিধানিক অর্থ কয়লা। এটি ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস বা ব্যাসিলাস সেরিয়াাস বায়োভার অ্যানথ্রাসিস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রমণ। ১৮৭৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রোবের্ট কচ প্রথম অ্যানথ্রাক্স এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেন। তবে তারও পূর্বে ১৭৫২ সালে বিজ্ঞানী মারেট এবং ১৭৬৯ সালে বিজ্ঞানী ফোর্নিয়ার ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের প্রথম ক্লিনিকাল বর্ণনা দিয়েছিলেন। এর পূর্বে এটি ছিলো কেবলই ঐতিহাসিক বিবরণ। এ বিরল রোগটি মানুষের ক্ষেত্রে আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। এটি মহাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় দক্ষিণ ইউরোপে বেশি দেখা যায়। উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এ সংক্রমণ অস্বাভাবিক। বিশ্বব্যাপী বছরে কমপক্ষে দুই হাজার টি সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। এ সংক্রমণ সাধারণত ত্বকের সংস্পর্শ, শ্বাস- প্রশ্বাস বা অন্ত্রের শোষণের মাধ্যমে ঘটে। এ রোগে সংক্রমিত হওয়াার একদিন থেকে দুই মাসেরও বেশি সময় পরে লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। ত্বকে একটি ছোটো ফোস্কা দেখা যায় যার চারপাশে ফোলাভাব থাকে; যা প্রায়শই কালো কেন্দ্রবিন্দুসহ ব্যথাহীন আলসারে পরিণত হয়। জ্বর, বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট এর অন্যতম উপসর্গ। এছাড়াও, এ সংক্রমণে ডায়রিয়া (যার মধ্যে রক্ত থাকতে পারে), পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমিও হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে, অ্যানথ্রাক্স মূলত ব্যাকটেরিয়া জনিত গবাদি পশুর একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যায়। এরোগটি গরুর ডাকমিনা, ধাস ও ধড়াস নামেও পরিচিত। সাধারণত ক্ষুরাযুক্তপ্রাণী যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষে এ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। গবাদিপশুতে এ রোগের মৃত্যুর হার শতভাগ। আক্রান্ত বা মৃতপশুর সংস্পর্শে আসা মানুষেরও অ্যানথ্রাক্স হওয়ার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ। আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে এ রোগের জীবাণু মাটিতে প্রতিকূল পরিবেশে সুপ্ত অবস্থায় ‘স্পোর’ নামক একপ্রকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং অনুকূল পরিবেশে সক্রিয় হয়ে গবাদি পশুকে আক্রান্ত করতে পারে। তাই একবার কোথাও দেখা দিলে পরবর্তীতে বারবার সে এলাকায় এ রোগ

দেখা দিতে পারে। নিম্ন জলাভূমি, নদীর পাড় ও উপকূলীয় অঞ্চলে এর প্রকট প্রাদূর্ভাব দেখা যায়। সে হিসেবে আমাদের দেশে সাধারণত সিরাজগঞ্জ,মেহেরপুর, পাবনা,রাজবাড়ি, রাজশাহী ও টাঙ্গাইল জেলায় এ রোগটির প্রাদুর্ভাব বেশি। তবে চলতি বছরে সংক্রমণ দেখা দেয় রংপুরের বিভিন্ন উপজেলায় এবং উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুও ঘটে। গণমাধ্যমের বদৌলতে জানা যায় ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে এ সংক্রমণে ৪৩১ জন আক্রান্ত হয়।

গ্রীষ্মের শুরূ থেকে বর্ষাকাল (মার্চ-সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত, খরা মৌসুমের পরে হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে এবং বন্যার পরের সময়ই সাধারণত সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ সময়কাল। সংক্রমিত পশু-খাদ্য যেমন- ঘাস, কচুরিপানা ইত্যাদি;অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত মৃত পশুকে খোলা স্থানে ফেলে রাখলে শকুন, কুকুর, শেয়াল ইত্যাদি শবাহারী প্রাণি; কখনো কখনো মাছি এবং অ্যানথাক্স আক্রান্ত মৃত পশু পঁচে-গলে মাটিতে মিশে গেলে হাড় থেকেও পশুতে এ রোগ ছড়াতে পারে। আক্রান্ত বা মৃত পশুর শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, মাংস, হাড়, চামড়া, পশম বা নাড়ি-ভুঁড়ির সংস্পর্শ, আক্রান্ত পশুর মাংস খাওয়া, পশুর চামড়া এবং অন্যান্য উপজাত (হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি) প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে যুক্ত থাকার মাধ্যমে সাধারণত মানুষে এটি ছড়ায়। মূলত অ্যনথ্রাক্স আক্রান্ত পশুর মাংস কাটার সময় মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। পশু জবাই করা, সেটির মাংশ কাটাকাটি করা এবং মাংস ধোয়া বা রান্নার সময় অনেকক্ষণ মাংস, রক্ত ও হান্ডির সংস্পর্কে থাকতে হয়। সে সময় আক্রান্ত পশুর রক্তের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে অ্যানথ্রাক্স। মাংস কাটাকাটির সময় মানুষের শরীরের চামড়ায় কোনো রকম ক্ষত থাকলে তার দেহে অ্যানথ্রাক্সের জীবানু প্রবেশ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আমাদের দেশে পশুর অ্যানথ্রাক্স হলেও অনেক সময় তা জবাই করে মাংস কম দামে বিক্রি করে ফেলা হয়। ঐ মাংস কাটাকাটি করার সময় অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়া সম্ভাবনা থাকে। তবে পশু থেকে মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হলেও মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ হয় না।

পশুতে অ্যানথ্রাক্সের লক্ষণগুলো হচ্ছে- আক্রান্ত পশু হঠাৎ করে মারা যাওয়া,নাক, মুখ ও পায়ুসহ শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে রক্তক্ষরণ এবং বের হওয়া রক্ত জমাট না বাঁধা,প্রচন্ড জ্বর (প্রায় ৪০-৪২০ সে./১০৪-১০৭০ ফা:),শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া, জাবর কাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা, মাংস পেশীর কম্পন,

প্রাথমিকভাবে অস্তিরতা বা উত্তেজনা কাজ করলেও পরবর্তীতে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ও দাঁত কটকট করা, খিঁচুনি ও কাঁপুনি, সাধারণত ২-২৪ ঘন্টার ভেতর মারা যাওয়া এবং এক দিনের বেশি বেঁচে থাকলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় (জিহ্বা, গলা, বুক, নাভি) পানি জমে যাওয়া। পশুর দেহে মৃত্যুর পরবর্তী লক্ষণগুলোর মধ্যে মৃত পশুর পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠে, নাক, মুখ, প্রসাব ও মলদ্বার দিয়ে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হওয়া, মৃতদেহ শক্ত না হওয়া এবং অতি তাড়াতাড়ি পচন শুরু হওয়া অন্যতম। আর মানুষে অ্যানথ্রাক্স রোগটি সাধারণত তিনটি রূপে দেখা যায়। যথা-ত্বকের অ্যানথ্রাক্স, পরিপাকতন্ত্রের অ্যানথ্রাক্স ও শ্বাসতন্ত্রেও অ্যানথ্রাক্স। এর মধ্যে ত্বকের অ্যানথ্রাক্সই বেশি দেখা যায়। সাধারণত আক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসার ৩-১০ দিনের মধ্যে এ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ত্বকের অ্যানথ্রাক্সের সাধারণ লক্ষণগুলো হচ্ছে-প্রথমে চামড়ায় লালচে দাগ হয়, আক্রান্ত স্থান চুলকায় ও ফুলে উঠে, পরবর্তীতে আক্রান্ত স্থানে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারের ফোসকা উঠে, ফোসকার মাঝখানে পচনের মত কালচে দাগ হয়ে ব্যথাহীন ঘা এর সৃষ্টি হয়; তবে সাধারণত জ্বর থাকে না।

পশুর ক্ষেত্রে অ্যানথ্রাক্স রোগের চিকিৎসায় প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিগুণ মাত্রার পেনিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। অতিতীব্র সংক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণত চিকিৎসার সুযোগ থাকে না। মানুষ থেকে মানুষে অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়না, কিন্তু মানুষের শরীর এবং পোশাক অ্যানথ্রাক্স জীবাণু বহন করতে পারে। শরীর থেকে জীবাণু দূর করার জন্য ব্যাকটেরিয়া নিরোধক সাবান দিয়ে গোসল এবং গোসলের পানি ব্লিচিং বা কোনও ব্যাকটেরিয়া নিরোধক দ্বারা শোধিত করা এবং জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত জিনিসপত্র ৩০ মিনিটের অধিক সময় ধরে ফুটাতে হবে। কোনো কোনো জায়াগা থেকে জীবাণু ধ্বংসে ক্লোরিন ব্লিচিং কার্যকরী নয়; বরং এক্ষেত্রে ফরমালডিহাইড ব্যবহার করা উচিত। আক্রান্ত বাক্তির কাপড় পুড়িয়ে ফেলা জীবাণু ধ্বংসের একটি কার্যকর পদ্ধতি। মানুষ আক্রান্ত হবার পর যত দ্রুত সম্ভব অ্যানথ্রাক্স জীবাণুনাশক দিতে হবে; যত দেরি হবে জীবনের ঝুঁকি তত বাড়বে। মানুষের জন্য অ্যানথ্রাক্স টিকা প্রথম ১৯৫৪ সালে বাজারে আসে। ত্বকের অ্যানথ্রাক্স সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য অসুখ। তবে সময়মত চিকিৎসা না করালে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সকল সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এ রোগের চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে।

ও মৃত্যু ফাঁদ হতে রক্ষা পেতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, গবাদিপশু খামারি, কসাই, ভোক্তাদের সমন্বয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলা উচিত।

লেখক: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস খাগড়াছড়ি

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

মানব সভ্যতাকে যে রোগগুলো হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে, প্রাণঘাতী এইডস তার মধ্যে অন্যতম। এটি একটি নীরব ঘাতক। এ রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। তখন যেকোনো সংক্রামক জীবাণু সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা স্বাস্থ্য খাতের জন্য নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজারসহ বেশ কয়েকটি জেলায় সংক্রমণের হার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আয়োজিত এক স্বাস্থ্য বিভাগের বৈঠকে জানা যায়, ২০২৪ সালে এ হাসপাতালে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। চলতি বছরের অর্ধেক সময়েই তা দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৯১৭ জনের এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। এর মধ্যে ২৫ জন শিক্ষার্থী, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর আক্রান্ত হওয়া ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। একই ধরনের চিত্র দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গত জুন মাসে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে দ্বিতীয়বার একজন এইডস রোগী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কোভিডের সময় এই হাসপাতালেই আরেকজন এইডস রোগী প্রথমবার সন্তানের

নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তা ধীরে ধীরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এই মরণব্যাধি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক সংক্রমণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ইনজেকশনের সুচ ব্যবহার বিশেষত মাদকসেবীদের মধ্যে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। অভিবাসী শ্রমিক বা বিদেশফেরত কর্মীরা সচেতনতার অভাবে পরিবারে ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক লজ্জা ও কুসংস্কারের ভয়ে পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিতে মানুষ পিছপা হচ্ছেন।

এইডস একটি প্রাণঘাতী রোগ হলেও, সময়মতো চিকিৎসা ও সচেতনতার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আধুনিক কিছু ওষুধে রোগীর জীবন কিছুদিন বাড়ানো গেলেও সেসব চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেও মধ্যবিত্তের আয়ত্তে নেই। সরকার বিভিন্ন জেলায় ভলান্টারি কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার (VCT) চালু করেছে। এইডস আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে ১৩টি হাসপাতালে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু রয়েছে। এর মধ্যে যশোর একটি। যশোরে এইচআইভি পজিটিভ শতাধিক মানুষ রয়েছে। বর্তমানে যশোর সদর হাসপাতালের এআরটি সেন্টারে ২২০ জন এইচআইভি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে যশোর ছাড়াও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার মানুষ রয়েছেন। এইডস রোগীদের সামাজিক অবস্থান যেন নষ্ট না হয়, সেজন্য আমরা সচেষ্ট আছি। তাদের বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে আক্রান্তদের শতকরা ৯৫ ভাগ চিকিৎসার আওতায় আনার সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওগুলো মাঠপর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এইডস প্রতিরোধে সমগ্র দেশে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো খুবই প্রয়োজন। কনডম ও নিরাপদ সুচ ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল-কলেজে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের দেশে ফেরার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, কারণ বর বা কনে যদি এই ভাইরাসের বাহক হয়, তবে যৌন সম্পর্কের ফলে অন্যের শরীরে সহজেই প্রবেশ করবে এই ভাইরাস। প্রতিবার ইনজেকশন নেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ ও সূচ ব্যবহার করতে হবে। রোগাক্রান্ত প্রসূতির সন্তানের শরীরেও এইডস হতে পারে। সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ যৌন পেশাদারদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রভাব বেশি থাকে। মুমূর্ষু অবস্থায় রক্তের প্রয়োজন হলে অবশ্যই এইডস পরীক্ষা করে শরীরে রক্ত

দিতে হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিরোধমূলক সেবা পৌঁছে দেওয়া, সহজে টেস্টের সুযোগ তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, অনেক রোগী সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলেও পরীক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন, যা প্রতিরোধ কার্যক্রমে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সরকারের সরবরাহকৃত এআরটি ওষুধ পর্যাপ্ত আছে এবং চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সিভিল সার্জন কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধে একযোগে কাজ চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজে এইডস সংক্রমণ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে। অনেকেই ভুলভাবে মনে করেন, হাত মেলানো, একই প্লেটে খাওয়া বা পাশে বসে থাকার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায়—যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের ভুল ধারণা কেবল রোগীদের সামাজিকভাবে আরও কোণঠাসা করে তোলে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে উঠা-বসা দোষের নয়। তাদের সঙ্গ দেওয়া যায়। এ ধরনের রোগী নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে।

সীমান্তবর্তী জেলায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পুরো দেশের জন্য সতর্ক সংকেত। এইডস প্রতিকারের ব্যবস্থা যেহেতু এখনো অজ্ঞাত, সেহেতু প্রতিরোধই হবে এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শুধু অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই সচেতন করতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। গণমাধ্যম, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরও বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এইডস নির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে। এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতাই এখন মুখ্য বিষয়। তাই এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কার্যকর পদক্ষেপ।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর